দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে

নির্মল সেন

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন করে কিছুটা বিচার বিবেচনা করা উচিত। প্রশ্নটি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিভিশন আলোচনায় উঠেছিল। এ কথা সত্যি যে দেশ স্বাধীন হবার পর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিল। সাধারণ শিক্ষকেরা চাকরির একটি নিরাপত্তা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা যেন চাকরি পাওয়ার একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

শিক্ষার মান সম্পর্কে তেমন মূল্যায়ন যেন কোনদিনই করা হয়নি। তবে ইতিমধ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৪১। এর মধ্যে ৩৬ হাজার ৯৫৫টি সরকারী এবং ৯ হাজার ৫৮৬টি বেসরকারী। ১৯৯৬ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ৭৬৮। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৭১০ এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫ হাজার ৫৮।

এই হিসাব থেকে লক্ষ্যণীয় যে গত ৬ বছরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫৫টি। আর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ১৬ হাজারের মত। সাধারণ চোখে দেখতে গেলে মনে হবে দেশে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এবং শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু গভীরে গেলে একটি ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে।

গ্রাম বাংলায় সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের পদ বেশ লোভনীয়। অধিকাংশ এলাকায় বাড়িতে থেকে চাকরি করা যায়। সংসার দেখাশোনা করা যায়। থানা শিক্ষা অফিসারের বিরাগভাজন না হলে একই বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়া যায়। এ ছাড়া এই সকল শিক্ষকদের নিজের থানার বাইরে বদলি নিষিদ্ধ। আর সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য।

কিন্তু এর একটি ভিন্ন চিত্র দেখা গেল পরবর্তীকালে। একশ্রেণীর মানুষ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করল। কেউ নিজে জমি দিল, টুলটেবিল নির্মাণ করে দিল, কেউবা বিদ্যালয় গৃহ বানিয়ে দিল। তবে সকলেরই শর্ত হচ্ছে তাদের নিজের আত্মীয়স্বজনদের চাকরি দিতে হবে। এমনও দেখা গেল যে জমি এবং অর্থ সাহায্যের সুবাদে কোন কোন পরিবারের পিতা, পুত্র এবং পুত্র বধু প্রাথমিক শিক্ষক বনে গেছে।

এভাবে প্রথমে স্থাপিত হল একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর শুরু হল এই বিদ্যালয়ের নিবন্ধিকরণ নিয়ে থানা থেকে শুরু করে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত দেনদরবার। সকলেরই ধারণা এ বিদ্যালয়গুলি নিবন্ধিকরণ করা গেলে ভবিষ্যতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হবে। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, জমি বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করার সুবাদে সরকারী চাকরি পাওয়া যাবে।

হিসাব নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রায় অধিকাংশ এভাবেই স্থাপিত হয়েছিল। এক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এদিকে নজর পড়ল। এবং স্থির হল নতুন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধিকরণ করা হবে না। কিন্তু এরশাদ সাহেবের আমলে এসে সব বাঁধ ভেঙে গেল। নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শুরু হল। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ই সরকারী স্বীকৃতি পেল। আর এ পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার উপজেলা কর্তৃপক্ষের উপর শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রতি উপজেলায় হাট বসে গেল। লাখ লাখ টাকা লেনদেন হল একটি চাকরির জন্য। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন।

এবারে আর এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধিকরণ বন্ধ করা হল। এমন কি নিবন্ধিকৃত বিদ্যালয়গুলোকেও সরকারীকরণ করা হল না। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবসায়ীরা তাতেও নিরস্ত হলেন না। তাই গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বুঝাতে এখন শুধু আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বুঝায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মোটা দাগে এখন তিন ভাগে বিভক্ত।

এই তিন ভাগ হচ্ছে-(১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। (২) নিবন্ধিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে অনিবন্ধিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী শিক্ষকদের মত বেতনভাতা পেয়ে থাকেন। নিবন্ধিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর একটি অংশ সরকারী প্রকল্প খাত থেকে কিছু সাহায্য পেয়ে থাকে। নিবন্ধিকৃত বাকী অংশ প্রকল্প খাত থেকে কোন সাহায্য পায় না। আর অনিবন্ধিকৃত বিদ্যালয়গুলোর সরকারী সাহায্য পাবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

এ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার একটি সরকারী এবং বেসরকারী চিত্র। এরপর আছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প খাতের ভিন্ন ভিন্ন নামের কিছু বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলো স্যাটেলাইট স্কুল এবং কমিউনিটি স্কুল হিসাবে পরিচিত। এই স্কুলগুলো প্রকল্প খাতের অর্থের উপর নির্ভর বলে প্রকল্প খাতে অর্থ না থাকলে এই স্কুলগুলো অচল হয়ে যায়। নির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুযায়ী এই স্কুলগুলো চলে না।

এরপরে আছে বেসরকারী সংস্থা এনজিওদের পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ক্ষেত্রে কোন কোন এনজিও সুনাম করলেও এ স্কুলগুলোও মুখ্যতঃ বেসরকারী অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষকদের বেতন আদৌ আকর্ষণীয় নয়। বেকার ছেলেমেয়েরা এ সকল বিদ্যালয়ে খন্ডকালীন চাকরি গ্রহণ করে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেউই দীর্ঘকাল এ চাকরিতে থাকে না। আর নিরন্তর শিক্ষক পরিবর্তনের জন্য এ সকল বিদ্যালয়ে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূন্যর কোঠায় দাঁড়িয়ে যায়। এর প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না। রাজধানী ঢাকা শহরে খুঁজলে এ ধরনের অসংখ্য বিদ্যালয়ের খোঁজ পাওয়া যাবে। অথচ গভীরে না গেলে উপর থেকে কিছুতেই এ পরিস্থিতি আঁচ করা যাবে না।

তাই প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের টেলিভিশন আলোচনার সূত্র ধরে বলতে চাই গত দীর্ঘদিন ধরে অনেক জঞ্জালই জমেছে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে। প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনও তার বাইরে নয়। তবে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে নিশ্চয়ই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি। এ হাতে খড়ি সঠিকভাবে না হলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা আদৌ সহজ নয়। তাই আমি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হলে ঐ প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে। এবং সেই শুরুটা হোক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই।